ইউনিট ৯

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। এ দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব ও উত্তর অংশের কিছু পার্বত্য ও উচ্চভূমি ছাড়া অবশিষ্ট এলাকা অসংখ্য নদনদী বিধৌত পলিমাটিযুক্ত উর্বর সমভূমি। দেশের পূর্ব ও উত্তর দিকে অবস্থিত লুসাই, গারো ইত্যাদি পাহাড়গুলো উত্তর ও দক্ষিন দিকে বিস্তৃত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা, কর্ণফুলি প্রভৃতি নদ-নদী এবং এদের উপ ও শাখা নদীগুলো (প্রায় ২৩০টি) উত্তর পূর্ব দিক হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরমুখি। কারণ উত্তর দিক হতে ভূমি ক্রমশঃ দক্ষিণে ঢালু হয়ে গিয়েছে। ফলে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা বাংলাদেশের সমতল ভূমি গঠিত। তবে ফরিদপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি জিলায় ২,৪৬৪টি জলাভূমিও রয়েছে।

পাঠ- ১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ জানতে পারবেন ও তাদের বিবরন দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরন দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ ২০°৩৪′ হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১′ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মাঝখানে দিয়ে অতিক্রম করেছে। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯০তম স্থানের অধিকারী বাংলাদেশের তিনদিকে স্থলভাগ এবং একদিকে সমুদ্র।

সীমা ঃ প্রায় তিন দিকেই ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা বাংলাদেশ। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭১৫ কি.মি. (২,৩০৯ মাইল) এবং মায়ানমার (বার্মা) সাথে প্রায় ২৮০ কি.মি. (১৭৪ মাইল)। তাছাড়া দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের প্রায় ৭২৪ কি.মি. (৪৫০ মাইল) উপকূল রেখা রয়েছে।

আয়তন ঃ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. (৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল)। এদেশের আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা প্রায় ২২ কি.মি. (১২ নটিকেল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল সমুদ্রের ইধংব খরহব থেকে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩৬৭ কি.মি. (২০০ নটিকেল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব পার্শ্বে ভারত এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। তাছাড়া দক্ষিন-পূর্বদিকে বান্দরবান এলাকায় মায়ানমারের সাথেও আমাদের কিছুটা সীমান্ত আছে।

বাংলাদেশের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ এবং এদের বিবরণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থানের মৃত্তিকা অনুর্বর, কোন স্থানের মৃত্তিকা লবণাক্ত আবার কোথাও পাহাড়িয়া অঞ্চল বলে এটি ভিন্নরূপ।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ ঃ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. পাহাড়িয়া মৃত্তিকা, ২. লোহিত মৃত্তিকা, ৩. লবণাক্ত মৃত্তিকা, ৪. পাললিক মৃত্তিকা এবং ৫. কোষ মৃত্তিকা।

১. **পাহাড়িয়া মৃত্তিকা ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বমোট প্রায় ১৮,৫৫৩ বর্গ কি.মি. ব্যাপী পাহাড়িয়া মৃত্তিকার অবস্থান। টারশিয়ারী যুগের বেলে পাথর ও কর্দম শিলা হতে এ জাতীয় মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল, সিলেট জেলার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে পাহাড়িয়া মৃত্তিকা দেখা যায়।

২. **লোহিত মৃত্তিকা ঃ** বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত উঁচু প্লাইষ্টোসিন চত্বরগুলোতে এক প্রকার মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এর আয়তন প্রায় ১১,০৯৫.৫৬ বর্গ কি.মি.। প্লাইস্টোসিন যুগের এ চত্বরগুলো ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড়, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড়, উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় নামে পরিচিত। এসব অঞ্চলের মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ বেশি। রাসায়নিক দিক হতে এসব মৃত্তিকাকে ল্যাটেরাইট শ্রেণীর মৃত্তিকা বলা যায়। লাল কাঁকড়যুক্ত হওয়ায় এ মৃত্তিকার বর্ণ লাল। তাই একে লোহিত মৃত্তিকা বলে।

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের মৃত্তিকা

৩. **লবণাক্ত মৃত্তিকা ঃ** বাংলাদেশের সুন্দবন এলাকাসহ উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়। লবণাক্ত মৃত্তিকার মোট আয়তন প্রায় ৫,৯৯৮.৪৪ বর্গ কি.মি.। জোয়ারের সময় উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করায় মৃত্তিকা লবণাক্ত হয়ে পড়ে। তাই এ অঞ্চলের মৃত্তিকাকে লবণাক্ত মৃত্তিকা বলে। সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চলের, সাবেক পটুয়াখালী এবং বরিশাল জেলায় এ মৃত্তিকা 'মহিনা' নামে পরিচিত।

৪. **পাললিক মৃত্তিকা ঃ** সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যতীত বাংলাদেশের সব প্লাবন সমভূমিগুলো আধুনিক যুগের পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৬,৮৩৭.৫ বর্গ কি.মি.।

এদের মধ্যে দো-আঁশ, বেলে ও কাদা-এ তিন ধরনের মাটি দেখা যায়। মাটির বর্ণ, কণার আকার এবং রাসায়নিক উপকরণের বৈষম্য অনুযায়ী এ মৃত্তিকার উর্বরতা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে পদ্মা নদীর পলি সঞ্চিত অঞ্চলের মৃত্তিকায় অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের পাললিক মৃত্তিকা অঞ্চলকে পুনরায় তিনটি মৃত্তিকা অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন-

(ক) ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি অঞ্চল ঃ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামের অংশবিশেষ এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার প্রায় সমগ্র অংশই এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। এ মাটি এঁটেল ও বেলে দোআঁশ। প্রায় ৪,০৯৬ বর্গ কি.মি. জুড়ে এ মৃত্তিকা অঞ্চল বিস্তৃত।

(খ) গঙ্গার পলিমাটি অঞ্চল ঃ সাবেক পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা জেলার গঙ্গানদী বিধৌত ভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর এবং চুনসমৃদ্ধ। ব্রহ্মপুত্রের পলল অপেক্ষা গঙ্গার তলানিতে চুনের পরিমাণ বেশি। ২৬,৮৮০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে এ মৃত্তিকা অঞ্চল বিস্তৃত।

(গ) তিস্তার পলিমাটি অঞ্চল ঃ সাবেক রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনার অংশবিশেষ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এর আয়তন ১৬,৬৪০ বর্গ কি.মি.। এ অঞ্চলের মাটি মোটামুটিভাবে উর্বর, তবে চুনের পরিমাণ খুবই কম। এ মাটিতে বেলে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ দৃষ্টিগোচর হয়। এ অঞ্চলের মাটিতে ধান, তামাক ও ইক্ষু ভাল হয়।

৫. কোষ মৃত্তিকা ঃ চট্টগ্রামের উপকূলে পুনরুদ্ধারকৃত কিছু বিলা জমি ৫/৬ বছর পর পর সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্যের অনুপযোগী হয়। স্থানীয় ভাষায় এ জাতীয় মৃত্তিকাকে কোষ মৃত্তিকা বলে। এ জাতীয় মৃত্তিকায় অম্লের পরিমাণ বেশি এবং এর উপরাংশের বর্ণ বাদামি বা হলদে। চুন বা ফসফেট জাতীয় সার প্রয়োগ করে এ মৃত্তিকায় কৃষিকার্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবে এ শ্রেণীর মৃত্তিকা ৫০/৬০ বছর পর চাষের উপযোগী হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং এদের উপনদী ও শাখা নদী দ্বারা বাহিত পলি দ্বারা নদীমাতৃক বাংলাদেশের মৃত্তিকা গঠিত যার ফলে বাংলাদেশ উর্বর মৃত্তিকার দেশ। তা সত্ত্বেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকার বুনট ও গঠনগত তথা গুণগত পার্থক্য আছে বিধায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা

ভূমির অবস্থা এবং গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক হতে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১. টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ, ২. প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি এবং ৩. সাম্প্রতিক প্লাবন সমভূমিসমূহ।
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির এ তিন প্রকার প্রধান বিভাগকে পুনরায় কতগুলো উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। নিচে এসব বিভাগ ও উপবিভাগসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১. টারসিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ ঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। সম্ভবত টারসিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হবার সময় এসব পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের এ টারসিয়ারী পাহাড়গুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ
(ক) দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং (খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ঃ রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অংশবিশেষে অবস্থিত পাহাড়সমূহ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পাহাড়সমূহ বিশাল পাললিক সমভূমি সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যময় ও অপরূপ করে তুলেছে। ভাঁজগ্রস্ত এ পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। অসংখ্য চিরসবুজ ছোট-বড় বৃক্ষরাজি দ্বারা এসব পাহাড় আবৃত।

(খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। সিলেট জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল সিলেট শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ১৮৬ বর্গ কি.মি. (৭২ বর্গ মাইল) জুড়ে বিস্তৃত। এ পার্বত্য ভূমির উচ্চতা ৬০ হতে ৯০ মিটারের (২০০-৩০০ ফুট) বেশি নয়। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরের প্রায় ৬৫ বর্গ কি.মি. (২৫ বর্গমাইল) স্থান ব্যাপী একটি টিলা পাহাড় অবস্থিত। এটি ছাতক পাহাড় নামে পরিচিত।

মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত পাহাড়গুলো কোনরূপ গিরিশ্রেণী গঠন করেনি। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এ দুটি জেলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে অবস্থিত।

বৃষ্টিযুক্ত এসব পাহাড়িয়া অঞ্চল চা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া এসব পার্বত্য ভূমিতে গ্যাস, চুনাপাথর ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

২. প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি (বা সোপানসমূহ) ঃ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এসব অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মাটি হতে এ অঞ্চলের মাটি সহজেই পৃথক করা যায়। এসব অঞ্চলের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) বরেন্দ্র ভূমি ঃ উত্তরবঙ্গের পদ্মা-যমুনার দোআঁশ অঞ্চলের মধ্যভাগে নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে এ সুবিশাল বরেন্দ্র ভূমি অবস্থিত।

এ আয়তন ৩২৪ বর্গ কি.মি. এবং বঙ্গ অববাহিকায় এটি সর্ববৃহৎ প্লাইয়োস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি। এ এলাকার ভূমি অসমতল এবং মাটি লাল ও কাঁকরময়। বরেন্দ্র ভূমিতে ধান, পাট, ভুট্টা, পান প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে।

চিত্র ২ ঃ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

(খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় ঃ উত্তরে সাবেক ব্রহ্মপুত্র নদ হতে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এটি প্লাইয়োস্টোসিন যুগে দ্বিতীয় বৃহত্তর উচ্চভূমি। এ উচ্চ উত্থিত অঞ্চলটির মোট আয়তন ৪,১০৫ বর্গ কি.মি. (১,৫৮৫ বর্গ

মাইল)। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশ মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য ঃ এর মাটির রং লাল এবং কংকর মিশ্রিত। ফলে গজারী বন ছাড়া অন্যান্য কৃষি ফসলের জন্য এ মাটি অনুপযুক্ত। এ অঞ্চলের ভূমি সমুদ্র হতে গড়ে প্রায় ৬ হতে ৩০ মিটার (১০ হতে ১০০ ফুট) উঁচু। তন্মধ্যে মধুপুর গড় এলাকা ভাওয়াল গড় হতে অধিক উচ্চে অবস্থিত। তাই অনেকে একে ক্ষয়িত পাহাড়ের অংশও বলে।

চাষাবাদ ঃ এ অঞ্চলে চাষাবাদ অনুপযুক্ত হলেও পানিসেচের দ্বারা বর্তমানে শাক-সব্জি, আনারস ও ধানের চাষ করা হচ্ছে।

(গ) ময়নামতি ও লালমাই পাহাড় ঃ কুমিল্লা শহরের ৮ কি.মি. (৫ মাইল) পশ্চিমে ময়নামতি ও লালমাই পাহাড় অবস্থিত।

আয়তন ঃ এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কি.মি.। গড় উচ্চতা ২১ মিটার (৭০ ফুট)। স্থানভেদে এর উচ্চতা ৪৬ মিটার (১৫০ ফুট) হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য ঃ এর মটির রং লাল। তাই একে লালমাই পাহাড় বলা হয়। এটি হস্ট শ্রেণীভুক্ত পাহাড় এবং বালি, নুড়ি, কংকর ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

চাষাবাদ ঃ এ অঞ্চলের পাহাড়ের পাদদেশে উর্বর মৃত্তিকায় কাঁঠাল, গোল আলু, তরমুজ, ফুটি ও প্রচুর মিষ্টি আলু জন্মে।

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি ঃ বাংরাদেশের অধিকাংশ এলাকা জুড়েই আছে প্লাবন সমভূমি অঞ্চল। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী এবং এদের উপনদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত।

বৈশিষ্ট্য ঃ এখানকার নদীগুলো প্রায় গতি পরিবর্তন করে বলে নতুন পলল ভূমি গঠিত হয়। এ সমভূমির গড় উচ্চতা ৯ মিটারের বেশি নয়। বর্ষাকালে অনেক নদী প্লাবিত হয় ফলে নদী অববাহিকায় পলি সঞ্চিত হয়। এ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক জলাভূমি ও বিল ছড়িয়ে আছে। এগুলো বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুভাবে এ সব বিলগুলোর উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রথমত কিছু বিল নদীর পরিত্যক্ত খাত থেকে সৃষ্ট এবং দ্বিতীয়ত অনেক বিল ভূ-আন্দোলনের সময় ভূ-অবনমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলে মেঘনার মোহনায় ছোট-বড় অনেক দ্বীপ ও ব-দ্বীপ রয়েছে।

চাষাবাদ ঃ এখানকার মাটি খুব উর্বর এবং মনুষ্য বাসের উপযোগী। এ অঞ্চল কৃষিকার্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ধান ও পাট প্রধান ফসল। এখানকার বিল-ঝিল ও হাওড়গুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। দেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উপকূলে খুলনা ও পটুয়াখালির নিম্ন সমতল ভূমি। এ এলাকায় প্রায় ১৬১ কি.মি. (১০০ মাইল) জুড়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন অঞ্চল। এখানে প্রচুর নরম কাঠ, পশু-পাখি, মাছ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ এ অঞ্চলটি কৃষিকার্যের উপযুক্ত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জন্য অর্থনেতিক দিক দিয়ে অঞ্চলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু সুন্দরবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখার জন্য এলাকায় প্রতিবছর প্রচুর দেশী-বিদেশী পর্যটক ভীড় করে। পর্যটন এলাকা হিসেবে এটি বিশেষভাবে আয়ের উৎস। তাছাড়া আছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং নানা রকম কাঠ যা উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার্য।

এ অঞ্চলকে আবার কয়েক অংশে ভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হল:

(i) পাদদেশীয় সমতল ভূমি ঃ এটি তিস্তা, আত্রাই প্রভৃতি নদীর পলি দ্বারা সৃষ্ট। বাংলাদেশের সর্বউত্তরে রংপুর ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এটি সাধারণ প্লাবন রেখা হতে বেশ উচ্ছে অবস্থিত। অন্যান্য সমতল অঞ্চল হতে এ গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩০ মি. (১০০ ফুট)।

চাষাবাদ ঃ এ অঞ্চলের নিম্নভূমি এলাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল চাষের তেমন উপযোগী নয়। প্রধান ফসল ধান ও পাট। তবে ইক্ষু ও তামাক উৎপাদনে এ অঞ্চল বিখ্যাত।

(ii) বন্যাপ্লাবিত সমভূমি ঃ ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল; যেমন- কুমিল্লা, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুরের বেশ কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বর্ষকালে এ অঞ্চল প্লাবিত হয়। এ অঞ্চলের মধ্যখানে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। রাজশাহী ও পাবনার চলন বিল এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটের হাওড়গুলো এখানকার অন্যতম বিল ও হাওড়।

চাষাবাদ ঃ এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর। ফলে প্রচুর ফসল জন্মে।

(iii) সিলেট উপত্যকা ঃ পাহাড়ের পাদদেশে অন্যান্য সমতল ভূমি অপেক্ষা নিচু। সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এটি ৩ মিটার উচ্চে অবস্থিত। এটি বন্যাঞ্চল হতেও নিচু।

চাষাবাদ ঃ বর্ষাকালে এ অঞ্চল পানিপূর্ণ থাকে। শীতকালে পানি সরে গেলে বোরো ও ইরি ধানের চাষ করা হয়। এখানে অনেক হাওড় আছে। তাতে মাছ চাষ করা হয়।

(iv) ব-দ্বীপ অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে। কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ এবং খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও ফরিদপুর এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীগুলো এ অঞ্চলের উপর অথবা পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে সর্বদা এ অঞ্চল নদী বিধৌত পলি দ্বারা প্লাবিত। নদীর মোহনায় অনেকগুলো দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও তালপট্টি। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো হল পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, কপোতাক্ষ, মধুমতি ইত্যাদি। ফলে পূর্ব অংশের ভূমি প্রায় প্রতিবছর প্লাবিত থাকে। অপরদিকে, খুলনা ও পটুয়ালালি জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল সুন্দরবন।

(v) কুমিল্লার সমতল ভূমি ঃ কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ সমতল ভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৭৪৩০ বর্গ কি.মি.। গড় উচ্চতা ৪ থেকে ৭ মিটার।

চাষাবাদ ঃ বর্ষকালে প্রায় প্লাবিত হয় বলে এখানকার ভূমি খুব উর্বর। এখানে ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

(vi) চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল ঃ এ অঞ্চলের বিস্তৃতি উত্তরে ফেনী জেলার ফেনী নদী হতে বঙ্গোসাগরের উপকূল বরাবর দক্ষিণে কক্সবাজর পর্যন্ত। গড় প্রস্থ সমুদ্র উপকূল হতে স্থানভেদে ৮/৯ কি.মি. (৫/৬ মাইল)। তবে কর্ণফুলী উপত্যকায় এর বিস্তার ২৪/২৫ কি.মি. (১৫/১৬ মাইল)।

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির অধিকারী একটি দেশ। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় পাহাড়িয়া উঁচুভূমি ও পলল সমভূমি দ্বারা বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও পরিবেশের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ব্যাপক। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যতার কারণেই বাংলাদেশ এত শস্যশ্যামল এবং ঈর্ষনীয় সুন্দর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লিখুন।
২। বাংলাদেশের সীমা লিখুন।
৩। বাংলাদেশের আয়তন লিখুন।
৪। বাংলাদেশের মাটি কতপ্রকার ও কি কি?
৫। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কতভাগে ভাগ করা যায়, ভাগগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরন দিন।

পাঠ- ২ বাংলাদেশের জলবায়ু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের বিবরন দিতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এদেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এদেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু' নামে পরিচিত। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও সমুদ্রের নৈকট্য এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এদেশে তেমন শীত বা উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু বর্তমান থাকলেও তিনটি ঋতুর সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাই আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত তিনটি ঋতুতে বিভক্ত করা যায়। যথা: (ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষকাল এবং (গ) শীতকাল।

(ক) গ্রীষ্মকাল ঃ বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। নিচে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেয়া হলঃ

১. **উষ্ণতা ঃ** বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা উষ্ণতম ঋতু হল গ্রীষ্মকাল। এ সময়কার সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৩৮° সে. এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ২১° সে.। গড় হিসেবে এপ্রিল হল উষ্ণতম মাস এবং এ মাসের গড় উষ্ণতা ২৮° সে.। মার্চ মাস হতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলে। সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ দিকে উষ্ণতা কম এবং উত্তর দিকে ক্রমশ বেশি থাকে।

২. **বায়ুপ্রবাহ ঃ** গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথে বঙ্গোপসাগর হতে উষ্ণ ও আর্দ্র মৌসুমী বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। অপরপক্ষে, একই সময় উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। বিপরীতমুখী এ দু বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষের ফলে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। বাংলাদেশে একে কালবৈশাখী বলা হয়।

৩. **বৃষ্টিপাত ঃ** বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে প্রধানত কালবৈশাখীর সাথে বজ্র ও বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে মোট বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় ২০ ভাগ হয়। গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সে.মি.। অবশ্য বিভিন্ন বছর এর তারতম্য হয়ে থাকে।

(খ) বর্ষাকাল ঃ বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়কে বর্ষকাল ধরা হয়। মৌসুমী বায়ুর আগমন দ্বারা বর্ষার সূচনা হয়। নিচে বর্ষাকালের উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেয়া হলঃ

১. **তাপমাত্রা ঃ** বর্ষকালে তাপমাত্রার তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি না হলেও আবহাওয়া মোটামুটিভাবে উষ্ণ থাকে। বর্ষকালের গড় উষ্ণতা প্রায় ২৮০ সে.। এ ঋতুতে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে।

২. **বৃষ্টিপাত ঃ** বর্ষার সময়ে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সে.মি. এবং সর্বোচ্চ ৩৪৫ সে.মি.। দেশের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব অঞ্চলের দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমান্বয়ে অধিক। যেমন- জুলাই মাসে রাজশাহীতে ২৮.৬৭ সে.মি. নারায়ণগঞ্জে ৩৪.৭০ সে.মি., সিলেটে ৩৩.৬৮ সে.মি. এবং কক্সবাজারে ৯৩.৩৫ সে.মি.। এ সময়ে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সর্বাধিক গরম পড়ে। বর্ষার সময় গড় উষ্ণতা বিরাজ করে প্রায় ২৬.৬৬° সে.।

৩. **বায়ুপ্রাবাহ ঃ** বর্ষার শেষের দিকে বঙ্গোপসাগরে মাঝে মাঝে ঝড়ের উৎপত্তি হয় এবং ঘূর্ণিঝড় উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিক হতে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের উপকূল ভাগে আঘাত হানে। এ ঝড়ের গতিবেগ প্রায় ১০০ মাইলেরও অধিক। ফলে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত এলাকার ব্যাপক অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন হয়। বাংলাদেশে এ সময়ের ঝড়কে 'আশ্বিনের ঝড়' বলে এবং এ ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টি হয়।

(গ) শীতকাল ঃ বাংলাদেশের শীতকাল নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি *মাস পর্যন্ত* স্থায়ী হয়। বাংলাদেশে শীতকাল শুষ্ক থাকে। এ সময় সূর্য উজ্জল কিরণ দেয় এবং রাতে কনকনে শীত অনুভূত হয়। নিচে শীতকালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলঃ

১. **তাপমাত্রা ঃ** বাংলাদেশের শীতকালের তাপমাত্রার গড় ১১°-২৭° সে.। এ সময়ে উত্তর-পূর্ব দিক হতে আগত শীতল বায়ুপ্রবাহের ফলে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। এ ঋতুতে জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি শীত অনুভূত হয়।

২. **বায়ুপ্রবাহ ঃ** বাংলাদেশের উপর দিয়ে এ সময় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ুর সর্বনিম্ন আর্দ্রতা থাকে প্রায় ৩৬%। মৌসুমী শীতল বায়ুপ্রবাহের ফলে এ সময় তীব্র শীত অনুভূত হয়।

৩. **বৃষ্টিপাত ঃ** বাংলাদেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। দেশের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৪% ভাগ এ সময় হয়। এ দেশের পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে এ ঋতুতে তুলনামূলকভাবে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশে এ সময় প্রায় ৫-১৫ সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

উপরোল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উষ্ণ, আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মকাল এবং হাল্কা, শীতল ও শুষ্ক শীতকাল প্রভৃতি প্রধান। এ অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের বসবাসের জন্য খুবই আরামদায়ক। অর্থাৎ এখানে খুব শীতও নয় এবং খুব গরমও নয়। সম্প্রতি ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ুর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের বিবরণ

বাংলাদেশ সমভাবাপন্ন ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু লক্ষ করা যায়। জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।

বাংলাদেশের জলবায়ু ঃ জলবায়ুর তারতম্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত ছয়টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল; ২. ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল; ৩. ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল; ৪. ক্রান্তীয় মৃদু আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল; ৫. উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল; ৬. উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অঞ্চল।

১. **ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল ঃ** বাংরাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকা ক্রান্তীয সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চরের অন্তর্গত। এখানকার তাপমাত্রা পরিমিত। বার্ষিক গড় উষ্ণতা গ্রীষ্ম ও শীতকালে যথাক্রমে ৩৩° সেঃ ও ১৩° সেঃ এর মধ্যে বিরাজ করে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে বার্ষিখ গড় বৃষ্টিপাত ২৪৫ সেঃমিঃ এর বেশি। তবে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার উপকূলীয় এলাকায় গড়ে ২২৮-৩০৫ সেঃমিঃ বৃষ্টিপাত হয়।

২. **ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল ঃ** চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চলের অন্তভুক্ত। এ অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ৩৮° সেঃ এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫৪ সেঃ মি. এর অধিক। অবশ্য বান্দরবান এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত ৩০০ সেঃমিঃ এরও অধিক।

৩. **ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল ঃ** পটুয়াখালী, নোয়াখালী, বরিশাল ও খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য এলাকা, যশোরের পূর্বাংশ; ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বাংশ ব্যতীত সমগ্র এলাকা; দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব সিলেট; পাবনা ও দক্ষিণ-পূর্ব বগুড়া নিয়ে এ জলবায়ু অঞ্চল গঠিত। অর্থাৎ বাংলাদেশের সমগ্র মধ্যাঞ্চল ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বার্ষিখ গড় উষ্ণতা ৪০° সেঃ এবং সর্বনিম্ন ৭° সেঃ। বার্ষিখ গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেঃমিঃ। তবে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

৪. **ক্রান্তীয় মৃদু আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল ঃ** পশ্চিম-দক্ষিণ বগুড়া ও পাবনা, দক্ষিণ দিনাজপুর, সমগ্র রাজশাহী ও কুষ্টিয়া এবং পশ্চিম-উত্তর যশোর অঞ্চল নিয়ে এ জলবায়ু গঠিত। বাংলাদেশের মধ্যে এ অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা শুষ্ক ও উষ্ণ। সর্বোচ্চ

উত্তাপ ৩৮° সেঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গড় বৃষ্টিপাত ১৫২ সেঃমিঃ এর কম। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের ফলে এ অঞ্চলের আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

চিত্র ৩ ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল

৫. **উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল ঃ** রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের দক্ষিণের সামান্য অংশ ব্যতীত সমস্ত এলাকা এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। অর্থাৎ শীতের সময় অত্যধিক শীত এবং গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক গরম পড়ে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩২° সেঃ এর অধিক এবং সর্বনিম্ন ১০° সেঃ এর কম। গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেঃমিঃ এর অধিক। তবে এর দক্ষিণ দিকের তুলনায় উত্তরদিকে ক্রমশ অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

৬. **উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল ঃ** সমগ্র সিলেট ও উত্তর-পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল নিয়ে এ জলবায়ু অঞ্চল গঠিত। বার্ষিখ গড় উষ্ণতা ৩২° সেঃ এর বেশি এবং সর্বনিম্ন ১০° সেঃ এর কম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০৫ সেঃ মিঃ এর বেশি। কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকে ক্রমেই বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমভাবাপন্ন মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের দেশ হলেও বাংলাদেশের নানাস্থানে নান ধরনের জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে এসব অঞ্চলে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পার্থক্য লক্ষণীয়। এ ধরনের পার্থক্যের কারণে অঞ্চলভিত্তিক কৃষিকাজ ও জীবনযাত্রাপ্রণালীও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

২। বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের নামগুলো লিখুন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জলবায়ুর বিবরন দিন।

২। বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলগুলোর বর্ণনা দিন।